আশ্রয়হারা মানুষদের বন্যা-পরবর্তী দুর্ভোগ

থমকে আছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন

রিপোর্ট : **বদরুল আলম নাবিল**

মাদারটেক আব্দুল আজিজ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সালমা। স্কুলের নিকটবর্তী ভাড়া করা একটি টিনের ঘরে সালমা তার বাবা-মা এবং ২ ভাই বোনের সঙ্গে থাকতো। সাম্প্রতিক বন্যায় তাদের বসত বাড়ি তলিয়ে যায় পানিতে। প্রথমে তারা নিজেদের ঘরেই ১টি চৌকির ওপর কয়েক দিন ছিল। চৌকিটিতে দু'জনের বেশি ঘুমানো যেত না, তাই রাতে দু'জন ঘুমাতো অন্য ৩ জন বসে থাকতো, তারপর আবার অন্য দু'জন ঘুমাতো এভাবে কেটে গেল কয়েক দিন। এরপর অতিবর্ষণে পানি আরো বেড়ে গেলে তারা ঘর ছেড়ে স্থানীয় আব্দুল আজিজ স্কুলে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে সালমার অধিকাংশ পাঠ্য বই, পাঠ্য উপকরণ বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। তার মা বাবাও সংসারের সব জিনিসপত্র সরাতে পারেননি।

বন্যার্তদের মাঝে নারী মৈত্রী ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ত্রাণ তৎপরতা

সালমাদের পরিবার স্কুলের যে কক্ষে আশ্রয় নেয় সে কক্ষে আরো ২৫টি পরিবার গাদাগাদি করে আশ্রয় নিয়েছিল। কোনো কোনো পরিবারে ৮ জন সদস্যও ছিল। এই স্কুলের আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় ৬০০ বন্যার্ত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। এদের জন্য মাত্র ৪ ল্যাট্রিন ছিল।

এই চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবারের অভাবে মানুষ কষ্ট পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তবে অ্যাকশন এইড, নারী মৈত্রী, লিভার ব্রাদার্স এবং স্থানীয় কমিশনার রান্না করা এবং শুকনো খাবার সরবরাহ করেছেন। নারী মৈত্রী এবং অ্যাকশন এইড প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ, খাবার স্যালাইন এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটও সরবরাহ করেছিল।

আশ্রয় কেন্দ্রে ১৬ দিন থাকার পর সালমাদের পরিবার আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে। কিন্তু বন্যা যে বিপর্যয় তাদের জীবনে নিয়ে এসেছে তা আজো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আশ্রয় কেন্দ্রে থাকাকালীন কয়েকজন ভলেন্টিয়ার ছেলে লেগেছিল সালমার পেছনে। তারা সালমাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতো।

এক পর্যায়ে এই বখাটে ভলেন্টিয়াররা তাকে শ্লীলতাহানীর হুমকি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার করে দেয় এসব কথা অন্য কাউকে বললে পরবর্তীতে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় তাকে যা কিছু করার করবে। এই ছেলেগুলো ছিল স্থানীয় কমিশনারের প্রচ্ছন্ন আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী, তাই তারা বেশ বেপরোয়া ছিল।

সালমা নারী মৈত্রীর কিশোর পরিষদের সদস্য ছিল। তাই নারী মৈত্রী তার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তারা ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলে তাদের নিবৃত্ত করে।

এখন সালমা আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে কিন্তু বইপত্র নষ্ট হয়ে গেছে বৃষ্টি এবং বন্যার পানিতে। ফুটপাতের দোকানদার বাবার রোজগার বন্ধ ছিল প্রায় ২ মাস। তাই স্কুলে বেতন বাকি পড়েছে ৩ মাসের। বেতন পরিশোধ করতে না পারলে তাকে পরীক্ষা

দেতে দিবে না। তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে।

এতো একজন সালমার গল্প। দেশের আনাচে কানাচে এ রকম লাখ লাখ সালমা আছে যাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে এই বন্যা।

বন্যার সময় বন্যা উপদ্রুত এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে। ফলে প্রায় মাস খানেক সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ ছিল। ফলে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বন্যাদুর্গত নয় এমন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছে। বন্যার্তদের আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়েছে, কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বন্যা উপদ্রুত সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলায় পরিদর্শনে গিয়ে আমরা দেখেছি অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এই বন্যা। কাজিপুরে শুভগাছা ইউনিয়নে অবস্থিত বিখ্যাত আর আই ডিগ্রি কলেজের সবগুলো ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। এই ক্ষতি কলেজটি ৫/৭ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারবে না যদি বড় রকমের আর্থিক সহায়তা না পায়। এই কলেজটির কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন থমকে গেল।

কাজিপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শহিদুজ্জামান ফারুকী সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, এই বন্যায় উপজেলার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং আরো ২৫১টি প্রতিষ্ঠানের আংশিক ক্ষতি হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার খলিল আহমেদ জানিয়েছেন তার উপজেলায় ২৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বন্যায়। জলো প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ জেলার ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ধুনটের ভান্ডার বাড়ি ইউনিয়নেই ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়েছে। জামালপুর জেলা প্রশাসন হুমায়ন কবির ২০০০কে জানিয়েছে তার জেলার ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ২৮৬টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এভাবে সারাদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন থমকে গেছে।

আমরা বন্যা উপদ্রুত এলাকাগুলো পরিদর্শনকালে সে সব এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা এবং সে সব কেন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা জানার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এসব তথ্য জানাতে পারেনি। বগুড়া জেলা প্রশাসক ২০০০কে বললেন, তার জেলায় সরকারিভাবে কোনো আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়নি। তাই এসব তথ্য তাদের কাছে নেই। কোথাও সরকারিভাবে আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করা হলে সেখানে আশ্রয় নেয়া মানুষদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হয় তাই সরকার সেদিকে যায় না। বন্যা উপদ্রুত মানুষ যে যেখানে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্ভব আশ্রয় নেয়। তারপর বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়।

এর বিপরীত চিত্রও পেয়েছি আমরা সিরাজগঞ্জে। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক ইবাদত আলী জেলায় আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা এবং আশ্রিত লোকদের সংখ্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট লিখিত তথ্য আমাদের দিয়েছেন।

আশ্রয়কেন্দ্রেও উঠে এসেছিল বন্যার পানি (উপরে)। নিচে আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুরা

সে যাই হোক বাংলাদেশ বন্যাপ্রবণ দেশ। প্রায় প্রতিবছরই দেশের নির্দিষ্ট কিছু অংশে বন্যা হয়। তাই দেশের এই সব বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা অনেকেই বলছেন। দেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে কিছু আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি হয়েছে গত তিন দশকে। এখন বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে এ ধরনের আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। এতে বন্যার্তদের দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে
ইউরোপিয়ান কমিশনের হিউমেনিটেরিয়ান এইড অফিস ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহায়তায়